# পরিবর্তিত কোরিয়া

## সিউলের চিঠি # ২

ড. মর্তুজা খালেদ

তিন বছর পরে কোরিয়াতে এসে এ দেশের অনেক পরিবর্তনগুলিই চোখে পড়ার মতো বলে মনে হয়েছে। মনে হয়েছে দ্রুত কোরিয়া বদলে যাচ্ছে, পাল্টে যাচ্ছে তার জীবন-ধারা, এর গতি প্রকৃতি। সিউল তথা দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান বিমান বন্দর ইনসিয়ন এয়ারপোর্ট থেকে বাসে শহরে ঢোকার পথেই দেখা যায় তৈরী হচ্ছে নতুন বড় বড় সব স্থাপনা। বিশালসব ক্রেন ব্যবহার করে একেকটা এলাকায় তৈরী হচ্ছে বড় বাসভবন। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান সমস্যা আবাসন। ছোট এই দেশে শিল্প কারখানাগুলি গড়ে উঠেছে মূলত রাজধানী সিউলকে কেন্দ্র করে। ফলে সারা দেশের সব কিছুরই কেন্দ্র বিন্দু এখন রাজধানী শহর। মানুষ ভীড় জমাচ্ছে সিউলে। শিল্প, ব্যবসাসহ দেশের প্রধান শিক্ষা নগরী এই শহর। শুধু মাত্র সিউলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৬টি। আর অধিক অংখ্যক মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিনিয়ত গড়ে তোলা হচ্ছে হাই-রাইজ ভবন। দেশের মোট এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর বাস এই রাজধানী শহরে।

তিন বছর আগে দীর্ঘ ছয় মাস কোরিয়াতে বাস করার অভিজ্ঞতা থাকায় সহজে তুলনামূলক একটা চিত্র তৈরী করতে পারি। কোরিয়াতে ঢুকেই যে অদৃশ্য বিষয় অনুধাবন করা যায় তা হলো এ দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি। জিনিষ-পত্রের দাম একটুও বাড়েনি বরং বিস্মিত হবার মতো বিষয় হলো বেশীরভাগ পণ্যের মূল্য আগের চাইতে কমে গেছে। আসলে খাদ্যসহ ভোগ্যপণ্য মূলত কোরিয়া আমদানী করে, কোরিয়ান মুদ্রা ওনের ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী অবস্থান এর জন্য দায়ী। তিন বছর আগে দেখেছি ১২০০ ওন দিয়ে এক ডলার কিনতে হতো এখন তা ৯০০ নেমে এসেছে। বাংলাদেশী মুদ্রায় হিসাব করলে বিষয়টা এই রকম আগে এক হাজার ওনের মূল্য মান ছিল ৫০ টাকার মতো এখন তা ৭০ টাকায় উঠে এসেছে। বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার মাত্র ২%। ১৯৬০-এর দশক থেকে কোরিয়ার উত্থানের যে ধারার সূত্রপাত ঘটে তা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। ১৮৫২ সালে জাপান পাশ্চাত্যের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে দ্রুত শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যায় যা জাপানের ইতিহাসে মেইজি রেষ্টোরেশন নামে খ্যাত। দ্রুত বিকশিত জাপানের সাথে পাল্লা দিতে ব্যর্থ হয় চীন ও কোরিয়া। ১৮৯৪ সাল থেকে কোরিয়া রূপান্তরিত হয় জাপানের পরোক্ষ উপনিবেশে। ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়ার উপর তার প্রত্যক্ষ আধিপত্য স্থাপন করে এ দেশকে জাপানের উপনিবেশে রূপান্তর করে। অবশ্য কোরিয়া তার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অনেক সংগ্রাম করেছে কিন্তু সে সকল প্রচেষ্টা সফল হয় নি। জাপানের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে।

কোরিয়ায় বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত পরিচিত ও পরম শ্রদ্ধাভাজন এক ব্যক্তিত্ব। কোরিয়ার শিল্প-সাহিত্য সম্মেলন বা কোরিয়া সম্পর্কে যে কোন গবেষণা সেমিনার শুরুর সময় তাঁর এ উক্তির উদ্ধৃতি এখনও দেওয়া হয়। কারণ ১৯৩০ সালে তার কোরিয়া সম্পর্কে করা উক্তি আজও কোরিয়গণ গৌরবের সাথে স্মরণ করেন। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের জাপান ভ্রমণের সময় পরাধীন দক্ষিণ কোরিয়ার কিছু ছাত্র তাঁর কাছে গিয়েছিলেন কোরিয়া সম্পর্কে বাণী প্রার্থনা করতে। সে সময় তিনি এক অবিস্মরণীয় উক্তি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তার ভাষায়, "এশিয়ার স্বর্ণযুগে কোরিয়া ছিল আলোক-বর্তিতা বিশেষ আর সে বাতি আবার জ্বলার অপেক্ষায় রয়েছে পূর্বকে আলোকিত করার জন্য," ("In the Golden Age of Asia, Korea was one of its lamp-bearers. And that lamp is waiting to be lighted once again. For the illumination of the East"), এভাবে বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ এ দেশে পরিচিত এক মুখ।

আগ্রাসী জাপান তার ভূমি-ক্ষুধা মেটানোর জন্য কোরিয়া থেকে ১৯৩১ সালে চীনের মাঞ্চুরিয়ায় তার দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। জাপান তার পশ্চিমে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল কোরিয়াকে কেন্দ্র করে। এর অংশ হিসাবে উপনিবেশিক আমলে কোরিয়ায় শিল্পায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং এভাবে জাপান কোরিয়াতে শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কোরিয়া রূপান্তরিত হয় আন্তর্জাতিক কেন্দ্র বিন্দু। কোরিয়া উপদ্বীপ সোভিয়েত সৈন্যরা জাপানী দখল দারিত্বমুক্ত করে, অপর দিকে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ অংশ মুক্ত করে। মীমাংসা প্রচেষ্টা ও অভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কোরিয়ার দুই অংশে প্রতিষ্ঠিত হয় দুই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা। উত্তর অংশ জনগণতান্ত্রিক কোরিয়া এবং দক্ষিণ অংশে সাধারণ পুঁজিবাদভিত্তিক প্রজাতান্ত্রিক কোরিয়া। শক্তি প্রয়োগে দুই কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এক ব্যর্থ যুদ্ধ চলে যা ক্ষয় করে কোটি কোটি মানুষের জীবন।

পঞ্চাশের দশকে কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন সীং ম্যান রী নামে এক অভিজাত যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষিত, অগণতান্ত্রিক ও ক্ষমতাকাঙ্খী এক শাসক। তিনি কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন চেষ্টাই করেন নাই। বরং কোরিয়াকে পাশ্চাত্যের আর্থিক সাহায্য নির্ভর করে রেখেছিলেন। অব্যাহত ছাত্র বিক্ষোভের মুখে ১৯৬০ তিনি বাধ্য হন পদত্যাগে। কোরিয়ার উত্থানের সূত্রপাত ঘটে ১৯৬১ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা স্বৈরশাসক পার্ক চীন হীর সময় থেকে। পার্ক চুন-হী কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তার জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে কোরিয়ার শিল্পায়নের এক রূপরেখা প্রণয়ন করেন এরপর দেশের বিশিষ্ট্য ব্যবসায়ী যারা চেবল নামে পরিচিত তাদের বাধ্য করেন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে। এ সকল শিল্পপতিদের জন্য রাষ্ট্রীয় ও বৈদেশিক ঋণের ব্যবস্থাসহ তাদের অকাতরে সাহায্য করেন। পার্ক চুন-হী দক্ষিণ কোরিয়ার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধবংস করেছিলেন সত্য সেই সাথে তার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনামলে এশিয়ার হত দরিদ্র এই দেশটি রূপান্তরিত হয় বিশ্বের অন্যতম শিল্প প্রধান এক রাষ্ট্রে। পার্ক চুন হীর শ্লোগান ছিল সবার আগে প্রয়োজন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। অবশ্য এই স্বৈরশাসককে তার মূল্য দিতে হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে তার নিজের দেহরক্ষী বাহিনী প্রধানের গুলিতে তিনি নিহত হন।

পাখীর চোখে ১৯৬০ সনে দঃ কোরিয়ার রাজধানী সিউল

পার্ক চুন-হী নিহত হলেও তার উত্তরসূরী চং দো হোয়ান দক্ষিণ কোরিয়ার শিল্পায়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেন। দ্রুত শিল্পায়ন করে নিজেদের দারিদ্রতা দূর করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্কে বলা হয় হান নদীর বিস্ময় (মিরাকল অন দি হান রিভার)। বর্তমানে এ দেশের মাথাপিছু গড় আয় ২৫,০০০ ডলার যেখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা ২,২০০ ডলার মাত্র। তা এশিয়ার মধ্যে চতুর্থ বৃহৎ এবং বিশ্বের দ্বাদশতম আর্থিক উন্নত এক দেশ। বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার বর্তমানে ৫.১% এবং বেকারত্বের সংখ্যা ৩.৪% মাত্র। কোরিয়া লক্ষ্য স্থির করেছে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সকে টপকিয়ে আরও সামনে এগিয়ে যাবার।

আর্থিক উন্নয়নের সাথে সাথে কোরিয়া পরিবর্তিত হচ্ছে। সিউলের সবচাইতে খ্যাতনামা কম্পিউটারসহ ইলেকট্রনিক সামগ্রির মার্কেট হলো ইংয়সান মার্কেট। তিন বছর আগে সেখানে দেখেছি সব দোকানের সামনে কম্পিউটার সামগ্রির বিভিন্ন কনফিগারের মূল্য তালিকা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হকারগণ জোর করে তা ক্রেতাদের হাতে তা ধরিয়ে দিত। এবারে গিয়ে দেখি সব সুনশান হকারদের সে প্রতিযোগিতা নেই। কি হলো? তবে কি কম্পিউটার বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল? না তা হয় নি, এখন সিউলে আর কেউ সেই আগের মতো ঢাউস ডেক্সটপ কম্পিউটার কেনে না। সবাই বিভিন্ন কোম্পানীর ব্যান্ড ল্যাবটপ কম্পিউটার কেনার দিকে ঝুঁকেছে। আর ডেক্সটপ কম্পিউটার থাকলেও তার আকৃতি ক্রমশ: চিকণ হয়ে তা প্রায় ল্যাবটপ কম্পিউটারের আকার নিয়েছে। প্রযুক্তির প্রতি কোরিয়দের প্রচন্ড আকর্ষণ পুরো জাতির মানসলোকে গড়ে তুলেছে নতুন এক পরাবাস্তব পৃথিবী----সাইবার ওয়ার্ল্ড। কোরিয়গণ মনে করেন একুশ শতকের পৃথিবীতে ইন্টারনেটসহ সাইবার প্রযুক্তি হলো বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবেশের এক দ্বার বিশেষ আর সে বিশ্বের উপযোগী করে জাতিকে তৈরী করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে কোরিয় কোম্পানী স্যামসং ও এল জি। তাদের পরিকল্পনায় রয়েছে ২০২৫ সালের মধ্যে কোরিয়াকে বিশ্বের এক নম্বর রবোটিক্স জাতিতে রূপান্তরিত করা আর ২০২০ সাল নাগাদ প্রত্যেক কোরিয়দের ঘরে অন্তত: একটি করে রোবট পৌঁছে দেওয়া।

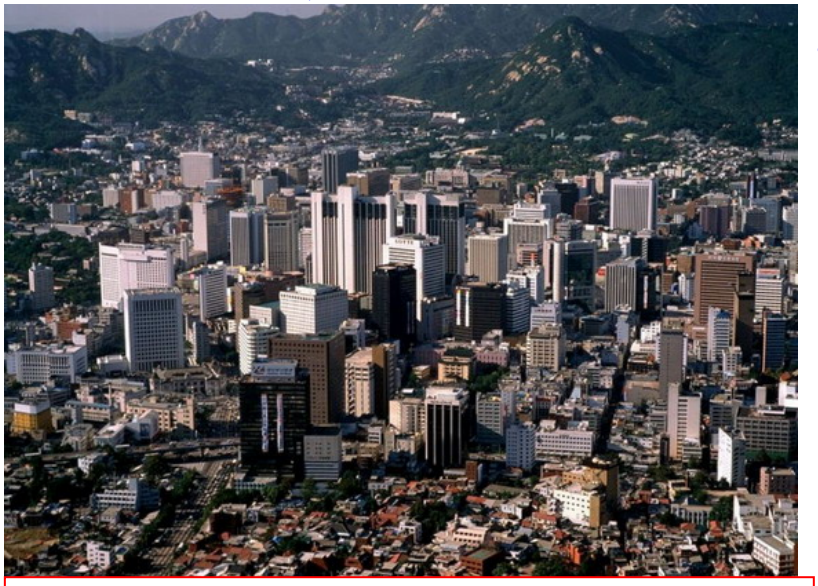

২০০৫ সনে তোলা শিল্প-বিপ্লবের শহর সিউলের একই স্থানের ছবি

সিউল শহরের আর এক বৈশিষ্ট্য হলো তা এক তারণ্যে চঞ্চল এক শহর। শহরের রাস্তায়, সাবওয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সর্বত্র চোখে পড়বে যুগল। পরস্পরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আশে পাশের পরিবেশ ভুলে নিজেদের নিয়ে বিভোর হয়ে আছে। প্রকাশ্যে চুম্বন দৃশ্য আগে দেখিনি এবারে অনেক স্থানেই কপোত-কপোতীরা প্রকাশ্য চুম্বন থেকে বিরত থাকছে না।

আগে দেখা যেতো মাঝারি আকারের দোকানগুলি ক্রেতা আকর্ষণের জন্য দোকানের সামনে কোরিয় তরুণীদের নাচের ব্যবস্থা রাখতো। স্বল্পবসনা, উগ্র সাজ-সজ্জার এ সকল তরুণী বিরতিহীনভাবে দোকানের সামনে নেচে যেতো উচ্চ শব্দের মিউজিকের সাথে। ইয়ানসাং মার্কেট, সুজিন মার্কেটে এটা এটা ছিল নৈমিত্তিক বিষয়। এবারে দুই বাজার ঘুরে কোথাও এই তরুণীদের নাম চোখে পড়লো না। মনে হয় সময়ের সাথে সাথে কোরিয় তরুণীদের আত্মমর্যাদাবোধ হয়তো বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর আগে কোরিয়াতে অনেক দরিদ্র মানুষ দেখেছি, দেখেছি অনেক ভিক্ষুক। সাবওয়েতে ক্যাসেট বাজিয়ে আবার কখনও নিজেদের দারিদ্রতার বিবরণ লেখা লিফলেট হাতে ধরিয়ে দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করছে। এবারে এসে দেখি তাদের সংখ্যা না কমে বরং তা বেড়েছে। কোরিয়রা সব বিষয়ে উদার হলেও ভিক্ষা দেবার বিষয়ে তাদের প্রচন্ড কার্পণ্য রয়েছে। বিশেষ করে কোন তরুণ-তরুণীকে ভিক্ষা দিতে কখনও দেখি নি। সুজিন বাজারে তিন বছর আগে পরিচয় হয়েছিল প্রাক্তণ এক সৈনিক বৃদ্ধর সাথে। দেখেছিলাম ভাঙ্গাচোরা এক ঠেলাগাড়িতে কাঁচি, ছুরি আর স্বল্প মূল্যের মেয়েলী গহনা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। এবার দেখি একইভাবে একই জায়গায় সেই একই জিনিষ-পত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। চেহারায় আরও ক্লান্ত আরও দারিদ্র্যতার ছাপ। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কোরিয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন আছেন?" চিনতে পারলেন না, না তবে হাত নেড়ে যা প্রকাশ করলেন তার অর্থ--ভাল নেই।

মনে অনেক প্রশ্নজাগলো ----- এত ধনী দেশেও কেন এই দারিদ্র্যতা? কেন রাষ্ট্র আগ্রহী হয় না এদের জীবন উন্নত করার? কেন এই বৃদ্ধকে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এই বয়সেও জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত থাকতে হয়? তবে কি দারিদ্রতাও এক চিরায়ত বিষয়---যা সব দেশে, সব কালে সবসময় থাকবে?

---

ড. মর্ত্তুজা খালেদ, দঃ কোরিয়া, ১০/০৮/২০০৭

তরুন এই ইতিহাসবিদ লেখকের পরিচিতি জানতে এখানে টোকা মারুন

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন